23

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

আমাদের শিক্ষা পাঠক্রম ও দুঃখিনী রোকেয়া

■ মা জে দা সা বে র ■

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'

বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতার এই পংক্তি দুটো আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বাগ্রে সত্য। হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর অমানবিক সামাজিক প্রথা ও নিষ্পেষণের হাত থেকে হিন্দু নারীকে উদ্ধার করার জন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের দুঃখে বিচলিত হয়েছিলেন। থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করে দরিদ্র যাত্রীদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। কিন্তু এদেশের মুসলমান মেয়েদের জন্য এগিয়ে আসার মত একজন উদার পুরুষ পাওয়া যায়নি দুর্ভাগা মুসলমান সমাজে। এ কাজে ব্রত হয়েছিলেন একজন নারী-রোকেয়া। তাঁরও ছিল একলা চলার পথ। নিজের সমাজকে তিনি খুব ভালো করেই চিনেছিলেন, 'আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।' তাই এ দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছিলেন।

যে নারীকে তিনি 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টজীব' বলে অভিহিত করেছেন জ্ঞানের আলো দিয়ে কুসংস্কার ও অশিক্ষার পঙ্কিল আবর্ত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য ১৯১১ সনে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, আর যাদের স্কুলে গিয়ে পড়ার বয়স ছিল না তাদের জন্য অর্থাৎ মেয়েদের মায়েদের জন্য করেছিলেন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম নামের মহিলা সংগঠন ১৯১৬ সনে।

রোকেয়ার আগেও মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দিনের আলো ভালো করে দেখার আগেই তাদের বিলুপ্তি ঘটে। রোকেয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় টিকে থাকে সবরকম প্রতিকূলতা ও বৈরিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

১৯৩২ সনের ৯ই ডিসেম্বর হঠাৎ রোকেয়ার মৃত্যু হলে স্কুলের ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু না, দেখা গেল অতটা নিরাশ অথবা হতাশ হবার মত কোন ব্যাপার না। ১৯৩৫ সনের ১৯শে ডিসেম্বর সরকার স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সনের ২রা জানুয়ারী মিস ভারতী চক্রবর্তীকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন।

দীর্ঘ একুশ বছরেও স্কুল সরকারী হল না বলে রোকেয়ার মনে যে আক্ষেপ ও স্কুলের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কা ছিল, পরপ্রার বসে তাঁর সেই আক্ষেপ ও শঙ্কা দূর হল। সরকারীকরণের ফলে স্কুলের অস্তিত্ব নিশ্চিত হল।

১৯৩৭ সনে প্রকাশিত হয় রোকেয়া সংক্রান্ত প্রথম বই শামসুন নাহার রচিত 'রোকেয়া জীবনী'। ১৯৬৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হলের নামকরণ হল 'রোকেয়া হল'। ১৯৭৩ সনে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত করে 'রোকেয়া রচনাবলী'। ১৯৮০ সনে নিবেদন করা হয় 'শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি'। সরকারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে রোকেয়া জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হয় সারাদেশে। ৯ই ডিসেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয় (শুধু সে বছরের জন্য)। বাংলাদেশ ডাক ও তার বিভাগ First Day Coverসহ দুটো স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করে। উপমহাদেশে উন্মোচিত হয় মহিলাদের উপর স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশিত হবার রুদ্ধদ্বার। ১৯৮৬ সনে রাজধানী ঢাকার একটা রাস্তার নাম রাখা হয় 'রোকেয়া সরণী'। ১৯৯৫ সনে প্রচলিত হয় 'রোকেয়া পদক'।

সবই ভালো, সবই ঠিক, সবই প্রশংসনীয়। কিন্তু আসলেই কি সব ভালো, সব ঠিক সব প্রশংসনীয়?

কবির ভাষায় 'মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর' দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার 'অর্ধেক তার করিয়াছে যে নারী'- শুধু এগুলো করলেই কি তাঁকে প্রকৃত সম্মান দেয়া হয়? হয় তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন?

রোকেয়া সম্বন্ধে জানে ক'জন? জানার কিংবা জানাবার কি ব্যবস্থা আছে? তাঁর করা স্কুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যারা পড়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তাদের কি রোকেয়া সম্বন্ধে জানার কোন উপায় আছে?

আমাদের শিক্ষা পাঠক্রম দেখে কি মনে হয়? যিনি এ দেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য নিজের জীবনের সব সুখ শান্তি আরাম জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সমাজের সব কটূক্তি নীরবে হজম করেছেন-তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানাবার কিংবা তার রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার কতটুকু সুযোগ শিক্ষার্থীদের আছে?

১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করার দায়িত্ব আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের। ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত 'আমার বই' নামের যে বাংলা পাঠ্যবই আছে তাতে রোকেয়া সংক্রান্ত কোন লেখা কিংবা রোকেয়ার কোন লেখার স্থান হয়নি। ১৯৯৭ সনের চতুর্থ শ্রেণীর 'আমার বই'-এ রোকেয়ার জীবনী ছিল, এবার তা বাদ দেয়া হয়েছে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবই 'চারুপাঠ', ৭ম শ্রেণীর 'সপ্তবর্ণা' ও অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কনিকা'রও একই ইতিহাস। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একজন কোমলমতি শিক্ষার্থী জানতে পারবে না রোকেয়া কে ছিলেন এবং এ সমাজের জন্য, নারী শিক্ষার জন্য তিনি কি ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন।

৯ম ও ১০ম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলনে (গদ্য) মতিচুর ১ম খন্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি'র অংশ বিশেষ সংকলিত হয়েছে 'জাগো গো ভগিনি' নামে। শুরুতে লেখিকা পরিচিতিতে তার বাবার নাম ভুল লেখা হয়েছে-জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। রোকেয়ার বাবার প্রকৃত নাম- জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সুলতানার স্বপ্ন' ও 'ডিলিসিয়া হত্যা' পৃথক গ্রন্থ বলে উল্লেখিত হয়েছে। বাংলা 'সুলতানার স্বপ্ন' ও 'ডিলিসিয়া হত্যা' পৃথক বই নয়। এ দুটোই মতিচুর ২য় খন্ডের অন্তর্ভুক্ত দুটো রচনা এবং রোকেয়া নিজে 'ডিলিশিয়া হত্যা' নয় 'ডেলিশিয়া হত্যা' লিখেছেন এবং পাদটীকায় তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন (ইংরেজী Sultana's Dream' পুস্তিকাকারে ছাপা হয় ১৯০৮ সনে)।

যদিওবা ৯ম শ্রেণীতে এসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড রোকেয়ার একটা প্রবন্ধ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সঙ্গে সরবরাহ করেছেন অসংখ্য ভুল তথ্য।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'সুবেহ সাদেক' নামের প্রবন্ধ ও পদ্মরাগ উপন্যাসের গল্পের প্রয়োজনে লেখা নামবিহীন কবিতাটিকে 'চাঁদ' নামে বাংলা সংকলনে দেয়া হয়েছে।

এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস সংগ্রহ করা যায়নি)- কেউই কোন পর্যায়ে রোকেয়াকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পর রোকেয়া পাঠ বন্ধ। যখন বাংলাভাষী মুসলমান মেয়েদের জন্য কলকাতায় একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ছিল না, সে সময় ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে যিনি যথাক্রমে মেয়েদের জন্য 'জেনানা মেডিক্যাল কলেজ', 'স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষক স্ত্রীলোক' দাবী করেছিলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোর্সে তার স্থান হয়নি। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু কি হতে পারে? রোকেয়া যদি দুঃখিনী না হন, তবে কে দুঃখিনী? ❑